রাষ্ট্রীয় বিশ্বাসভঙ্গ, এডওয়ার্ড স্নোডেন ও একজন নাগরিকের দায়বোধ

আতিয়া ফেরদৌসী চৈতী

জুলিয়ান এসেঞ্জ এবং রবার্ট ম্যানিং এর পর এডওয়ার্ড স্নোডেন যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থার ভয়াবহ পুলিশী চরিত্র উন্মোচন করেছে। তাঁদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্ঘাত রাষ্ট্রের ভয়ংকর আধিপত্যের বিরুদ্ধে নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে এক দৃষ্টান্তমূলক কিন্তু খুবই ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ। একটি তথ্যচিত্রে এই পরিস্থিতি উন্মোচন করেছেন লরা পয়ট্রাস। এই বিষয়েই এই পর্যালোচনা।

সিটিজেন ফোর কেবল একটি অসীম সাহসী ও দক্ষ হাতে তৈরি তথ্যচিত্রই নয়; এটি ১ ঘন্টা ৫৩ মিনিটের একটি সফর, যার শেষ প্রান্তে গিয়ে আপনি হয়তো আবিষ্কার করবেন যে, একবিংশ শতকের নাগরিক স্বাধীনতা আপনার দিকে ব্যঙ্গের হাসি ছুড়ে দিচ্ছে।

পরিচালক লরা পয়ট্রাস ভীষণ যত্ন ও মুনশিয়ানা নিয়ে এডওয়ার্ড স্নোডেনের দুঃসাহসিক পদক্ষেপগুলো শুরু থেকেই চিত্রায়িত করেছেন। এতটাই দক্ষতায় যে, কখনো মনে হতে পারে এটি আগে থেকে স্ক্রিপ্ট তৈরি করে, বার বার কেটেছেঁটে বানানো একটি হলিউডি থ্রিলার। কিন্তু সত্যিকার জীবনের নাটকীয়তা যে সিনেমাকে ছাপিয়ে যায়, এটি তার আরেকটি প্রমাণ।

পরিচালক প্রথমেই নিজের বয়ানে জানিয়েছেন, ২০০৬-এ ইরাক যুদ্ধ নিয়ে তাঁর তথ্যচিত্রটি বানানোর পর থেকেই তিনি মার্কিন গোপন নজরদারির তালিকাভুক্ত হন। ডজন খানেকবার তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে আটকানো হয়। 'গুয়ান্তানামো ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' ছিল সে সময় তাঁর পরবর্তী সিনেমাটির বিষয়বস্তু, যা আসলে ৯/১১ পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে বানানো তাঁর তিন পর্বের সিনেমার একটি।

শুরুতেই আমরা দেখি লরাকে সম্বোধন করে লেখা একটি মেসেজ, যা ভীষণ সতর্ক এক বার্তা নিয়ে পৌঁছায়; সতর্কতার কারণ যাতে এই যোগাযোগটি অব্যাহত রাখা যায়। মেসেজ প্রদানকারী নিজেকে রাষ্ট্রের একজন সিনিয়র ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তা হিসেবে পরিচয় দেয় এবং এই যোগাযোগের গোপনীয়তার স্বার্থে লরার পাসওয়ার্ড ও গোপন চাবির নিরাপত্তা জোরদার করতে অনুরোধ করে, যাতে নজরদারির হাত এই যোগাযোগ ব্যাহত করার সুযোগ না পায়। এই কর্মকর্তাকে আমরা দেখি মেসেজের শেষে নিজের নামের জায়গায় লিখতে 'সিটিজেন ফোর'।

এর আগে ২০১২-এর ডিসেম্বরে অনুসন্ধানী সাংবাদিক গ্লেন গ্রিনওয়াল্ডের কাছে অচেনা সূত্র থেকে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। তবে তারা নিরাপদ কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করতে না পারায় সেটি থেমে যায়।

এর এক মাস পর থেকে পরিচালক লরার কাছে আসতে শুরু করে সেই এনক্রিপ্টেড ফাইলগুলো, যা মার্কিন পার্লামেন্টকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুখ খোলাতে বাধ্য করে। লরার কাছে প্রকাশিত হতে থাকে যে তার করা প্রতিটি ফোন কল, তার পাঠানো প্রতিটি মেইল, তার লেখা প্রতিটি আর্টিকেল—এমনকি তার প্রতিটি বন্ধু, চলাচলের প্রতিটি রাস্তা বা প্রতিটি কেনাকাটা—কোনো কিছুই গোপন নজরদারির বাইরে নয়। তিনি সতর্ক হন এবং নিজের ডিভাইসগুলোর নিরাপত্তা আরো জোরদার করেন।

পর্দায় আসেন উইলিয়াম বিনি, যিনি ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির গোপন সংকেত বিশেষজ্ঞ এবং গণিতবিদ। ৯০-পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর কাজে মনোযোগ স্থাপন করেন ইন্টারনেট ও ডাটা পর্যবেক্ষণের ওপর। তিনি এজেন্সিতে কাজ করেছেন টানা ৩৭ বছর এবং ধাঁধা সমাধানের কাজটি তিনি উপভোগ করতেন। হোপ সম্মেলনে তিনি অকপটে স্বীকার করেন, ৯/১১-এর এক সপ্তাহের মধ্যে এনএসএ মার্কিন সমস্ত নাগরিকের ওপর নজরদারি করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা সেটি শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তার পরিসর বাড়াতে থাকে। মার্কিন টেলিকম কোম্পানি এটিঅ্যান্ডটি তার

ভোক্তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে প্রতিদিন প্রায় ৩২০ মিলিয়ন ব্যক্তিগত ডাটা এনএসএকে সরবরাহ করতে থাকে। বিনির সাথে আরো চারজন এই প্রকল্পের ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা সরকারি হস্তক্ষেপ কামনা করেন, যাতে এই বেআইনি কাজটি থামানো সম্ভব হয়। কিন্তু বিনি পরবর্তীতে বুঝতে পারেন, এটি ছিল বোকার মতো আশা। তিনি হুমকির সম্মুখীন হন এবং এজেন্সি থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হন।

পার্লামেন্টে এনএসএর ডিরেক্টর কেইথ আলেক্সান্ডারের বক্তব্য শুনতে পাই আমরা, যেখানে তিনি অবলীলায় বলে যান এনএসএ কোনো মার্কিন নাগরিকের ফোন কল, ই-মেইল সার্ভিস, অ্যামাজন অর্ডার লিস্ট, গুগল সার্চ–এসবের ওপর নজরদারি করে না। এটি করতে তাদের আইনসম্মত কোনো ক্ষমতাও নেই। অথচ সেই 'সিটিজেন ফোর'-এর মেসেজে দাবি করা হয়, এ সবই নির্জলা মিথ্যা, যা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ তার কাছে আছে। এনএসএ এই মুহূর্তে সর্বকালের সবচেয়ে বেশি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে চোখ রাখছে এবং এর সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

২০০৬-এ সান ফ্রান্সিসকোতে একজন টেকনিশিয়ান বুঝতে পারেন, এটিঅ্যান্ডটি নেটওয়ার্কের ফোন ট্যাপ করা হচ্ছে। তিনি ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ভঙ্গের মামলা করেন। সেই মামলার শুনানিতে আমরা দেখতে পাই রাষ্ট্রপক্ষের খোঁড়া যুক্তি ও সত্য অস্বীকার করার প্রবণতা।

'অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট সিকিউরিটি ট্রেনিং'-এ আমরা সাংবাদিক ও সফটওয়্যার ডেভেলপার জ্যাকব এপেলবামকে দেখতে পাই। তিনি সেখানে নজরদারির মাধ্যমে পৌঁছানো ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

মূলত এগুলো ছিল ভূমিকা। সিনেমাটির আসল অংশ শুরু হয় তখন, যখন সিটিজেন ফোর নামক সূত্রটি লরা পয়ট্রাস ও গ্লেন গ্রিনওয়াল্ডের সাথে দেখা করতে উদ্যোগী হয়। পরিচালকের সাথে ২০১৩-এর জুনের ৩ তারিখে আমরা চলে যাই হংকংয়ের 'দ্য মিরা' হোটেলের একটি কক্ষে, যেখানে পরিচালক প্রথম তাঁর ক্যামেরাটি অন করেন। পরিচালক নিজেই বললেন যে সেটি তিনি বন্ধ করতে পেরেছিলেন তার আট দিন পর। দিনটি ছিল সোমবার। আমরা পর্দায় এক স্বপ্নকামী, হাস্যোজ্জ্বল, সুদর্শন তরুণকে আবিষ্কার করি, যার কথাগুলো শুনতে শুনতে আমরা বুঝতে পারি, এই আপাত সরল হাসিমুখের ছেলেটির ভেতরে লুকিয়ে আছে এক আশ্চর্য সংবেদনশীলতা, যার তাড়নায় সে এমন এক সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছে, যা তার জীবনকে একঝটকায় বদলে দেবে। জেল, দেশত্যাগ কিংবা আরো খারাপ কিছু তার জন্য নিশ্চিতভাবেই অপেক্ষা করে আছে; অথচ ব্যক্তিজীবনের কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার মূল্যে এই তরুণ সেসব এড়াতে রাজি নয়।

তার সাথে কথোপকথনে বেরিয়ে আসতে থাকে–যে মার্কিন ইন্টেলিজেন্স গণতন্ত্র কিংবা ব্যক্তিস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে পৃথিবীর বহু স্থিতিশীল দেশকে ভয়ংকর সব পরিণতির দিকে *ঠেলে* দিয়েছে, খোদ তারাই তাদের দেশের মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে অবলীলায় লঙ্ঘন করছে। স্পষ্টভাবেই তিনি বলে দেন কেন তিনি ইন্টেলিজেন্সের এই গোপন তৎপরতাকে ফাঁস করছেন: *"রাষ্ট্র যখন সাধারণের সক্ষমতাকে উপেক্ষা করে, তখন অর্থপূর্ণভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ করতেই আমার এই চেষ্টা।"* মার্কিন প্রশাসন স্পষ্টতই এই দেশের মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, যতটা আমরা আন্দাজ করছি তার চাইতেও বেশি। আমরা ইন্টারনেটে কী ঘেঁটে দেখছি সেটা নজরদারির আওতায়ই কেবল পড়ছে না, প্রয়োজনমতো সেখানে সীমাও আরোপ করা হচ্ছে। বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধানের ওপর তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

পরদিন মঙ্গলবার এই তিনজনের সাথে যোগ দেন দ্য গার্ডিয়ানের ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টার ইউয়েন ম্যাকআস্কিল। এই রিপোর্টারের সামনে সিটিজেন ফোরকে আমরা এডওয়ার্ড স্নোডেন হিসেবে পরিচয় দিতে শুনি, যিনি 'এড' নামে কাছের মহলে পরিচিত। স্নোডেন জানান, তাঁর কাছের কেউই তাঁর এই তৎপরতার কথা জানে না; বন্ধু, সহকর্মী, পরিবার–কেউ না। তাদের কারো আন্দাজ করারই কথা নয়। তিনি কাজ করছেন 'বুজ এলেন হ্যামিলটন' নামের একটি ডিফেন্স কনট্রাক্টর সংস্থার সাথে। তিনি এনএসএর সাথে চুক্তিভিত্তিক কাজ করছেন। তিনি নিজে একজন মিলিটারি পরিবারের সন্তান। স্নোডেন জানান, তিনি বুঝতে পারছেন তাঁর হয়তো পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখা আর সম্ভব হবে না তাদের নিরাপত্তার স্বার্থেই। যেটি নিঃসন্দেহে এই মুহূর্তে তাঁর জন্য সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার।

> ২০০৬-এ ইরাক যুদ্ধ নিয়ে তাঁর তথ্যচিত্রটি বানানোর পর থেকেই তিনি মার্কিন গোপন নজরদারির তালিকাভুক্ত হন। ডজন খানেকবার তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে আটকানো হয়। 'গুয়ান্তানামো ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' ছিল সে সময় তাঁর পরবর্তী সিনেমাটির বিষয়বস্তু, যা আসলে ৯/১১ পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে বানানো তাঁর তিন পর্বের সিনেমার একটি।

তিনি ব্যাখ্যা করেন কিভাবে এনএসএ চাইলেই যে কারো আইপি অ্যাড্রেস, ক্রেডিট কার্ড, এমনকি পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারে কিংবা যে কারো মেইল পড়ে ফেলতে পারে। তিনি জিসিএসকিউ (মার্কিন সরকারি যোগাযোগের হেড কোয়ার্টার)-এর কথা তোলেন, যা মূলত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নেটওয়ার্ক হস্তক্ষেপের প্রোগ্রাম। এদের একটি শক্তিশালী প্রোগ্রাম হলো টেমপোরা, যা প্রতিটি মেটা-ডাটাকে পর্যন্ত ব্যবহার করতে সক্ষম। তিনি হোটেল রুমের ভিওআইপি ফোনটিকে দেখিয়ে জানান যে এগুলোর প্রতিটির ভেতরে থাকে একটি মিনি কম্পিউটার, চাইলে এগুলোর যে কোনোটি দিয়ে যে কাউকে ট্র্যাক করা সম্ভব, কথা শুনে ফেলা সম্ভব।

এসএসও বা স্পেশাল সোর্স অপারেশন হচ্ছে ইউএস ও তার বাইরের বিভিন্ন নেটওয়ার্কের এক সংগ্রহ। প্রিজম নামক গোপন অপারেশনের পরে এটির আবির্ভাব। বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন, বেতনভোগী প্রতিষ্ঠান, এমনকি কিছু দেশের সরকারের সহযোগিতায় তারা বিভিন্ন নেটওয়ার্ক কব্জা করে ও ডাটা সংগ্রহ করে। একটি রিপোর্ট থেকে স্নোডেন দেখান, ২০১১ অর্থবছরে তাঁরা একেকটি ডিভাইস থেকে এক বিলিয়ন টেলিফোন কল মনিটর করেছেন। তাঁরা সেকেন্ডে ১২৫ গিগাবাইট ডাটা সংগ্রহ করতে সক্ষম। এটি সায়েন্স ফিকশনের মতো শোনালেও সত্য যে এই সিস্টেমও এখন বাতিলের দলে। ক্রমশই নতুন নতুন প্রোগ্রামের মাধ্যমে এই নজরদারির ক্ষমতা দ্রুত বেড়েই চলেছে।

এই আলোচনার ছয় ঘণ্টা পর গ্রিনওয়াল্ড তাঁর প্রথম স্টোরি প্রকাশ করেন। সিএনএন প্রকাশিত রিপোর্টে আমরা দেখি, ইউএস ইন্টেলিজেন্স প্রতিদিন প্রায় এক মিলিয়ন ভেরাইজন গ্রাহকের রেকর্ড

ঘাঁটছে নিরাপত্তার অজুহাত দিয়ে। এমন নয় যে তারা কেবল তাদের সন্দেহভাজন কিংবা অপরাধীদের ফোনের কথা শুনছে; মূলত তারা ভেরাইজনের প্রতিটি গ্রাহকের ফোন নির্বিচারে রেকর্ড করছে প্রতিদিন।

এদিকে স্নোডেন হোটেল কক্ষে বসে জানতে পারেন যে তাঁর সঙ্গীকে ইন্টেলিজেন্স থেকে জেরা করা হচ্ছে। স্নোডেন বুঝতে পারেন তাঁর ভালোবাসার মেয়েটির সাথে হয়তো যোগাযোগ রক্ষা করা আর সম্ভব হবে না। আমরা স্নোডেনের মুখে বিষণ্নতা দেখতে পাই, আবার একই সাথে তিনি জানান যে তিনি অবাক হননি। তিনি জানতেন, এমনটাই হবে। পরিস্থিতি আরো বেশি খারাপ হওয়ার আগেই এ সময়গুলোকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে তিনি মনোযোগী হতে বলেন সবাইকে।

দ্বিতীয় স্টোরি প্রকাশ করেন পরিচালক নিজে আরেকজন সাংবাদিক বার্টন গেলম্যানের সাথে যৌথভাবে। ওয়াশিংটন পোস্টে সেটি প্রকাশিত হয়। সেখানে দেখানো হয়–৯টি প্রথম সারির ইন্টারনেট কোম্পানি তার ব্যবহারকারীদের গোপন মেইল ও মেসেজ, অডিও, ভিডিও, ডক্যুমেন্ট এবং যোগাযোগের তালিকা এনএসএকে সরবরাহ করছে। এর মধ্যে আছে মাইক্রোসফট, গুগল, ইয়াহু, স্কাইপি, এপল, এওএল, ফেসবুক ও ইউটিউব। ২০০৮-এর পর আইনগতভাবে 'নন-আমেরিকান'দের কথোপকথন শোনার জন্য ওয়ারেন্টের প্রয়োজন বাতিল করা হয়। যদিও আমেরিকান নাগরিকদের জন্য ওয়ারেন্টের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু এনএসএ তার তোয়াক্কা করছে না। গ্রিনওয়াল্ড তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেন, *"এনএসএর ঘাড়ের ওপর দিয়ে কে আমাদের দেখছে, সেটি জানার কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই। রাষ্ট্র নিজেই আইন ভাঙছে। আবার সেটি যারা প্রকাশ করতে যাচ্ছে, তাদের ওপর নেমে আসছে হুমকি।"*

> ৯/১১-এর এক সপ্তাহের মধ্যে এনএসএ মার্কিন সমস্ত নাগরিকের ওপর নজরদারি করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা সেটি শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তার পরিসর বাড়াতে থাকে। মার্কিন টেলিকম কোম্পানি এটিঅ্যান্ডটি তার ভোক্তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে প্রতিদিন প্রায় ৩২০ মিলিয়ন ব্যক্তিগত ডাটা এনএসএকে সরবরাহ করতে থাকে।

এদিকে স্নোডেন জানতে পারেন তাঁর বাড়িভাড়ার চেকটি কাজ করছে না। ফলে তাঁর সঙ্গী লিন্ডসেকে (সুসংবাদ যে সে বেঁচে আছে ও ভালো আছে) বাড়ি ছাড়তে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। স্নোডেন তার দিকে ঘনায়মান বিপদ আঁচ করতে পারেন ভালোভাবেই। তাঁর ভাষায় অনুভূতিটি 'ভীতিকর, তবে মুক্তিদায়ক'!

এদিকে মিডিয়ায় তোলপাড় শুরু হলে ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্সকে নতুন করে শ্রেণীকরণ করার চিন্তা করতে শুরু করে মার্কিন প্রশাসন।

স্নোডেনের মুখে আমরা শুনতে পাই জিসিএসকিউয়ের নিজস্ব একটি উইকিপিডিয়া আছে, যা ভীষণ গোপন। ইন্টেলিজেন্সে কাজ করে এমন যে কেউ যে কোনো বিষয় নিয়ে সেখান থেকে তথ্য, যেমন– ডক্যুমেন্ট, ছবি, পাওয়ার পয়েন্ট ইত্যাদি পেতে পারে। টেমপোরার মতোই এটি কাজ করে। টউঅঈ হচ্ছে তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ সার্চ 'টুল'।

স্নোডেন এই পর্যায়ে নিজেই মিডিয়াতে নিজেকে প্রকাশ করতে সম্মত হন। প্রথমেই তিনি এটি করেননি, যাতে তাঁর নিজস্ব চিন্তা জনমতকে প্রভাবিত না করে। সে কারণে তিনি দায়িত্বশীল সাংবাদিকদের সহায়তা নিয়েছেন বলে জানান। কারণ এটি একটি খুবই সংবেদনশীল ইস্যু। এটি তাঁর ব্যক্তিগত বিষয় নয়, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন এতে সম্পর্কিত। স্নোডেন সাবলীলভাবেই জানান, তিনি ভীত নন। যে কোনো সময় তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে আগ্রহী। কারণ প্রত্যেকের এও জানা উচিত যে তিনি নিজে এই কাজে ভয় পাননি।

স্নোডেন অবশেষে নিজের সাক্ষাৎকারটি ধারণ করেন লরার ক্যামেরায়, যা সারা পৃথিবীর মানুষ দেখতে পায় এবং ইউএসসহ সারা পৃথিবীর মানুষ আরেকবার নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয়। রেকর্ডটি প্রকাশিত হয় জুনের ১০ তারিখ।

প্রায় সাথে সাথেই ইউএস প্রশাসন তাঁর বিরুদ্ধে 'ক্রিমিন্যাল কেস' দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে আমরা স্নোডেনকে দেখতে পাই রেজার হাতে দাড়ি কামানো নিয়ে চিন্তা করতে। দাড়ি ছোট নাকি বড় করলে তাঁকে সহজে চেনা যাবে না তা নিয়ে কথা বলতে। হোটেল রুমের টিভিতে টক শোগুলোতে যখন স্নোডেনের উচ্চ প্রশংসা আর বিভিন্ন উপন্যাসের চরিত্রের সাথে তাঁর উচ্ছ্বসিত তুলনা চলছে, তখন আমরা স্নোডেনকে দেখি সামনের অনিশ্চয়তার কথা ভেবে মুখ বাঁকিয়ে বিরক্তি নিয়ে চুল আঁচড়াতে, দীর্ঘশ্বাস ফেলতে। লরাকে উদ্দেশ করে বলতে শুনি, *"আমি গ্রেপ্তার হই বা আমার যা-ই হোক, তুমি ও গ্রিনওয়াল্ড রিপোর্ট প্রকাশ চালিয়ে যেয়ো।"*

এর মাঝেই তাঁর অবস্থান ফাঁস হয়ে যায়। হোটেল রুমে তাঁর কাছে অসংখ্য সাংবাদিকের ফোন আসতে শুরু করে। সেসব এড়াতে তারা লরার রুমে অবস্থান নেয়। এর মাঝে তারা দুজন আইনজীবীর সাথেও যোগাযোগ করে। তাদের একজনের সাথেই স্নোডেনকে আমরা বেরিয়ে যেতে দেখি নিরাপদ কোনো আশ্রয়ের উদ্দেশে।

এরপর ধীরে ধীরে স্নোডেনের পুরো আর্কাইভ প্রকাশিত হতে থাকে। ওবামা প্রশাসন নানা বিতর্কে জড়াতে থাকে এবং তারাও স্নোডেনকে কোণঠাসা করার চেষ্টা চালাতে থাকে তাদের স্বাভাবিক নিয়মেই। স্নোডেন জাতিসংঘের কাছে তাঁর রিফিউজি স্টেটাসের জন্য আবেদন করেন এবং আত্মগোপনে চলে যায়। লরা হংকংয়েই থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু অল্প সময়েই সে আবিষ্কার করে, তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। ফলে ছয় দিন পর সে বার্লিনে ফিরে যায়।

এর পরের সময়ে আমরা স্নোডেন ও লরার খুব সতর্ক কিছু মেসেজ আদান-প্রদান দেখতে পাই, যেখানে স্নোডেন আশঙ্কা প্রকাশ করে, যে কোনো সময় এই সংযোগটি ধ্বংস করা হতে পারে। ফলে আবার নতুন করে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। লরা প্রস্তাব করে, সে যদি স্নোডেনের কাছে কোনো ক্যামেরা পাঠায় তাহলে সে তার সময়গুলো ধারণ করতে পারবে কি না। কিন্তু স্নোডেন জানান, তিনি যেখানে আছেন, সেখানে জোরে কথাও বলতে পারেন না। এই আশ্রয়দাতার কোনো রকম ক্ষতির ঝুঁকি তিনি নিতে পারবেন না।

এরপর আমরা চলে যাই রিও ডি জেনিরোর 'ও গ্লোবো' নিউজ এজেন্সির অফিসে। গ্রিনওয়াল্ডকে সেখানে কাজ করতে দেখি। তার সাথেও লরার গোপন ও সতর্ক যোগাযোগ হয়। তারা দুজনেই ইউএসএতে ফিরতে শঙ্কা প্রকাশ করে; কারণ নিশ্চিতভাবেই

সেখানে তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় জেরা ও তদন্ত অপেক্ষা করে আছে।

এই পর্যায়ে আমরা লন্ডনের দ্য গার্ডিয়ানের অফিস দেখতে পাই। সেখানকার সাংবাদিকদের দেখি নিজেদের অনলাইন নিরাপত্তা বাড়াতে কাজ করতে। তারা তখন টেমপোরা বিষয়ক রিপোর্টটি প্রকাশের কাজ করছিল। তারা টেলিকম কোম্পানিগুলোর নাম প্রকাশেও ভয় পাচ্ছিল।

জুনের ২১ তারিখ ইউএস সরকার স্নোডেনের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা দাঁড় করায় এবং হংকংকে অনুরোধ করে স্নোডেনকে ফিরিয়ে দিতে। উইকিলিকস সে সময় স্নোডেনের হংকং ত্যাগ ও রাজনৈতিক আশ্রয়ের দায়িত্ব নেয়।

পর্দায় আসেন জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ। তিনি জানান সেই নাটকীয় পরিস্থিতির কথা, যখন স্নোডেন মস্কো এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর পরপর ইউএস তাঁর পাসপোর্ট বাতিল করে। ফলে স্নোডেনকে 'টার্মিনাল' সিনেমার টম হ্যাঙ্কসের মতো অনাগরিকে পরিণত হয়ে টার্মিনালে আটকা পড়ে থাকতে দেখা যায়।

এদিকে ব্রাসিলিয়াতে ব্রাজিলের সিনেটে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে এনএসএর নজরদারির কথা সমালোচিত হয়। সেখানে কয়েকজন তরুণকে আমরা দেখি স্নোডেনের ছবি হাতে প্রতিবাদস্বরূপ দাঁড়িয়ে সংহতি জানাতে। গ্রিনওয়াল্ড সেখানে এনএসএর গোপন কর্মকাণ্ড নিয়ে কথা বলেন।

> "রাষ্ট্র যখন সাধারণের সক্ষমতাকে উপেক্ষা করে, তখন অর্থপূর্ণভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ করতেই আমার এই চেষ্টা।" মার্কিন প্রশাসন স্পষ্টতই এই দেশের মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, যতটা আমরা আন্দাজ করছি তার চাইতেও বেশি।

বার্লিনে আন্তর্জাতিক আইনজীবীরা স্নোডেনের আইনগত পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন। সেখানে আমরা স্নোডেনের আইনজীবী বেন ইউজনারের মুখে শুনতে পাই, রাষ্ট্রপক্ষ স্নোডেনের বিরুদ্ধে 'শত্রুপক্ষের কাছে রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ফাঁস'-এর অভিযোগ তুলছে, ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য মিডিয়ার কাছে রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য বিক্রির অভিযোগ তুলছে। স্নোডেনকে একজন স্পাই হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে। আবার এই সম্ভাবনাও আছে যে, এই তিনটি মামলা যে কোনো সময় তিন শ মামলায় পরিণত হতে পারে এবং প্রতিটির জন্য আলাদাভাবে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হতে পারে।

এদিকে স্নোডেন তাঁর মেসেজে লরাকে জানান, এফবিআই ও সিআইএ অসংখ্য বিদেশি অংশীদার নিয়ে একসাথে কাজ করছে স্নোডেনের অবস্থান জানার জন্য। জুলাইয়ের ২০ তারিখে ইউকে সরকার ম্যাকআস্কিলকে দেওয়া জিসিএসকিউয়ের আর্কাইভ নষ্ট করে ফেলতে চাপ প্রয়োগ করে।

এদিকে টানা চল্লিশ দিন শেরেমেতিয়েভো এয়ারপোর্ট ট্রানজিটে আটকে থাকার পর স্নোডেন এক বছরের জন্য রাশিয়ায় রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করতে সক্ষম হন। হোয়াইট হাউস ক্রমাগত স্নোডেনকে একজন মারাত্মক অপরাধী হিসেবে আখ্যায়িত করতে থাকে এবং তাঁর দেশে ফেরার ব্যাপারে জোর দিতে থাকে। ওবামাকে বলতে শোনা যায়, তিনি মোটেই ভাবেন না যে স্নোডেন আদতে একজন দেশপ্রেমিক। স্নোডেনের তথ্য ফাঁসের আগেই তিনি এই নজরদারি কার্যক্রমকে পুনরায় যাচাই করতে ফেডারেল হস্তক্ষেপের কথা ভেবেছিলেন। তিনি আইনগত সমাধানে বিশ্বাসী, যাতে মার্কিন জনগণ একটি কল্যাণকর অবস্থানে পৌঁছতে পারে।

এদিকে গ্রিনওয়াল্ড ও তাঁর সহকর্মীদের হয়রানি করা শুরু হয়।

২০১৩-এর সেপ্টেম্বরে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট ইউরোপের জনগণের ওপর এনএসএর নজরদারি নিয়ে শুনানির আয়োজন করে। সেখানে এপলবাম গোপনীয়তা হারানো আর স্বাধীনতা হারানোকে এক সূত্রে দাঁড় করান। তিনি বলেন, নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ আসলে একই রকম অর্থ প্রকাশ করে।

সফটওয়্যার প্রোগ্রামার লাডার লেভিসন সেখানে লাভাবিট নামক একটি নিরাপদ মেইল যোগাযোগের প্রোগ্রামের সাথে পরিচিত করান এবং জানান যে তাঁকে এফবিআই থেকে চাপ দেওয়া হয়েছে প্রোগ্রামটির 'সিকিউরিটি' চাবিগুলো তাদের সরবরাহ করতে। তিনি সেটি করেননি; কারণ তিনি কারো ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নন এবং তিনি আইনগত অনুসন্ধানে বিশ্বাসী।

বার্লিনে জার্মান পার্লামেন্ট যে শুনানির আয়োজন করে, সেখানে একজন ইন্টেলিজেন্ট বিশেষজ্ঞ হিসেবে উইলিয়াম বিনি সাক্ষ্য দেন। সিআইএ জার্মানির ওপর নজরদারির জন্য জোড়া গুপ্তচর এজেন্সি নিয়োগ করেছে—এই খবরে তাঁর সাক্ষ্য প্রদান বাধাগ্রস্ত হয়।

তথ্যচিত্রটির শেষ অংশে আমরা চলে যাই মস্কোর সেই বাড়িটিতে, যেখানে স্নোডেন তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে অবস্থান করছেন। ২০১৪-এর জুলাইতে লিন্ডসে সেখানে যান। গ্রিনওয়াল্ড, লরা ও স্নোডেন আবার একত্র হতে সক্ষম হন। তাঁদের আড্ডায় আমরা দেখি কিছু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বা বাক্য তাঁরা একে অপরকে লিখে জানাচ্ছেন। আলোচনায় বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের উদ্বেগ আমরা টের পাই। আলোচনা শেষে গ্রিনওয়াল্ড কাগজগুলো কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলেন। সেই ছেঁড়া কাগজগুলো টেবিল থেকে কুড়িয়ে নেওয়ার দৃশ্যের মধ্য দিয়ে এই তথ্যচিত্রটি শেষ হয়।

মার্কিন দাপটের মুখে থাকা প্রতিটি দেশের প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষের জন্য এক জরুরি নির্মাণ এই তথ্যচিত্র। বাক্‌স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফেরিওয়ালা হিসেবে পরিচিত মার্কিন প্রশাসনের সত্যিকার চেহারা আর তার বিরুদ্ধে জীবন বাজি রাখা কয়েকজন তরুণের উদ্যম আর সাহসিকতা একে বস্তুতই আলাদা এক মাত্রা দান করেছে। রাষ্ট্র যখন বিশ্বাসঘাতক হয় এবং নাগরিকের ওপর তার অন্যায় ক্ষমতার জোর দেখাতে চায়, তখন মানুষ মরিয়া হয়ে তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে; আর সাধারণের শক্তির সাথে রাষ্ট্র কখনো পেরে ওঠে না, পেরে ওঠা সম্ভব নয়—এমন বার্তাই আমরা পাই শক্তিশালী এই তথ্যচিত্রে।

আতিয়া ফেরদৌসী চৈতী: শিক্ষার্থী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: chaity.srsp@gmail.com